

বাংলা সাহিত্যে ভবা পাগলার গানের প্রাসঙ্গিকতা

আশিস দাস

গবেষক, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ সংঘমিত্রা ঘোষ

অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

মন্দিরনগরী অম্বিকা কালনায় বহু সাধক, মনীষী, সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের কর্মের দ্বারা সমাজ তথা রাষ্ট্র বা দেশকে গর্বিত করেছেন। এমনই এক মহামানবের চরণ স্পর্শে ধন্য এ শহরের মাটি, ধন্য এ দেশের মানুষ, শত শত ব্রহ্মজ্ঞানের জননী ভারতমাতা। এইসব সাধক, সাধু, সন্ত ও ভক্তদের কেউ কেউ যেমন জগৎবিখ্যাত, আবার কেউ বা আছেন পাদপ্রদীপের অন্তরালে। তেমনই একজন সাধক, কবি, গায়ক, শিল্পী, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গানের রচয়িতা হলেন প্রচার বিমুখ শ্রী শ্রী ভবাপাগলা। তিনি বলতেন, “খবরে গেলেই তো গোবরে গেলাম!” তাঁর লৌকিক নাম ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী। মা ডাকতেন ভৈবা, শিষ্য ভক্তরা বলেন পাগল। তিনি ১৯০২ সালের ১৭ই অক্টবর, শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ভবাপাগলা ছিলেন সঙ্গীতময়। তাঁর সকল বানী, উপদেশ, দর্শন, চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমই ছিল সঙ্গীত। তাই তিনি গানের ভাষায় বলেছেন-

“গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

লাগে না ফুল চন্দন,

মন্ত্র তন্ত্র লাগে না”

তাঁর গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে শাক্ত-পদাবলী, শ্যামাসংগীত, প্রেমরস, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও সমাজ সংস্কারের দিকগুলি। সাহিত্যের এই দিকগুলি তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভবা পাগলার সঙ্গীতের মধ্যে সাহিত্যের যে দিকগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি আমার এই নিবন্ধের বিষয়।

মূল শব্দঃ সাহিত্য, সঙ্গীত, ভবা পাগলা।

ভূমিকা:

ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী, যিনি ভবা পাগলা নামেই অধিক পরিচিত, আপন ব্যক্তিত্ব প্রতিভায় যে সৃষ্টি-সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সত্যি অনস্বীকার্য। তিনি বিংশ শতাব্দীর সিদ্ধ-সাধক, কবি, মহাপুরুষ, মহামানব, ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক, বাদক, সঙ্গীতশিল্পী, মুৎ-শিল্পী, সূচী শিল্পী। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি আপন প্রতিভাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আঁকে আপামর শিষ্য, ভক্ত, শ্রোতা, পাঠকমণ্ডলী ‘ভবাপাগলা’ নামেই আপন করে নিয়েছেন। তাঁর জীবন দর্শন ও চেতনা পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও তিনি থেকে গেছেন আড়ালে। জীবন শিক্ষায় তিনি যে অসীম অনন্তেরই নামান্তর, তা রীতিমতো চর্চার বিষয়। আত্ম আরাধনার যে ভিন্ন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তা ভবা পাগলাকে সিদ্ধ পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আপনাকে নানাভাবে জানার ও বোঝার কৌশলকে তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা -

“যত খুঁজবি হারিয়ে যাবি

বই পুস্তক আর চন্ডিগীতা,

আত্মনির্ভর এই তো ঈশ্বর

খুলে দ্যাখ তোর মনের খাতা।”

সত্যিই মনের পাতা উল্টে যতই তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করি ততই মনে হয় তিনি নিজ কর্মকাণ্ডে সমাজের আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে থেকেও হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র। কেননা তিনি একেবারে বালক বয়স থেকেই মা কালীকে আঁকড়ে ধরেই বড়ো হয়েছেন। কখনো খেলার ছলে, কখনো বা আপন মনে আত্মহারা হয়ে মাতৃনামে ডুব দিয়ে খুঁজেছেন জীবনের রসদ। আর এসবই তিনি ব্যক্ত করেছেন গানে গানে। তাই তো তিনি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ- ভালোবাসার প্রত্যেকটি মুহূর্তে অসীম মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন মন ভোলানো গানের মধ্য দিয়ে। মানুষের মনে চৈতন্য আনয়ন করার জন্য সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন বলেই তো বলেছেন-

“গানই আমার দেবী মূর্তি,

গানই আমার স্মৃতি।”

অবাক হলেও সত্যি যে ভবেন্দ্রমোহন তাঁর দীর্ঘ ৮৪ বছরের জীবনে প্রায় ৮৬ হাজার গান রচনা করেছেন বলে তাঁর পরিচিত মহল ও পরিবার সূত্রে জানা যায়। যদিও কালের প্রভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেশভাগ, সর্বোপরি ভবেন্দ্রমোহনের বৈচিত্র্যময় জীবন বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রচুর গান আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে কালনা কালীবাড়িতে পনেরটি খাতায় প্রায় ৬ হাজারের অধিক গান আজও সযত্নে রক্ষিত। তিনি সংগঠক ছিলেন না। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে ভবা পাগলার অমূল্য সঙ্গীতগুলি আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে রাখার ক্ষেত্রে তিনি নিজেও খুব একটা সচেতন ছিলেন না বলেই মনে হয়। সেই সঙ্গে তাঁর পরিবার পরিজন, শিষ্য, ভক্তমণ্ডলী অনেকেই তাঁর মূল্যবান সঙ্গীতগুলিকে রক্ষা করা, এক

জায়গায় সংগ্রহ করে রাখা বা প্রকাশ করার নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। যদিও জীবন উপলব্ধির কথা, জ্ঞানের কথা তিনি রেখে গেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণের জন্য অতি সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি তাঁর। যাকে বোঝার জন্য অতি শিক্ষিত হওয়ার কোন দরকার নেই।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. শাক্ত পদাবলীর ধারায় ভবা পাগলার পদগুলির গুরুত্ব তুলে ধরা।
২. বৈষ্ণব পদকর্তাদের চিন্তা ও চেতনার সাথে ভবা পাগলার চিন্তার অভিন্নতা খুঁজে বের করা।
৩. ভবা পাগলার গানের সাহিত্যমূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করা।

গবেষণার প্রশ্ন:

১. শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে ভবা পাগলার অবদান কতখানি?
২. বৈষ্ণব পদকর্তাদের চিন্তা ও চেতনার সাথে ভবা পাগলার মিল কোথায়?
৩. ভবা পাগলার গানের সাহিত্যমূল্য কতখানি?

গবেষণা পদ্ধতি:

পদ্ধতিগত দিক থেকে এই গবেষণাটি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে প্রাথমিক ও গৌণ উৎস ব্যবহার করা হয়। গৌণ উৎস বেশি ব্যবহৃত হয়। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্ন বই, নিবন্ধ, এবং সাক্ষাৎকার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রধানত গুণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, অধ্যয়নটি গুণগত।

- শাক্ত পদাবলীর ধারায় ভবা পাগলা:

রামপ্রসাদ থেকে কমলাকান্ত, নজরুল হয়ে ভবেন্দ্রমোহন এই তিন শতকে শাক্ত পদসাহিত্য প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের মিলিত এক মিশ্রিত সাহিত্যধারা। যেখানে বিষয় একে এতগুলি কবিকে একত্রে গাঁথা হলেও ভক্তির দিক থেকেই সকলেই সমপর্যায়ের নন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ভবেন্দ্রমোহন এরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাধক কবি, ভক্তিবাদী। সংগীত রচনা ছিল তাদের বিশ্বাস ও তর্পনের নামান্তর। গান দিয়েই তারা মূর্তি উপাসনা করেছেন। সুরই তাদের মূলমন্ত্র।

রামপ্রসাদী এই ভক্তিময় গীতিকবিতার আদি গঙ্গোত্রী তিনি স্বার্থ উপাসনা কে শাস্ত্রাচারের নির্দেশ ও তন্ত্রাচারের আরণ্যক কর্মকাণ্ড থেকে তুলে এনে কর্মপাশবদ্ধ সাধারণ মানুষের সহজ মাতৃ ব্যাকুলতার প্রাঙ্গণ বেদীতে রোপন করেছিলেন। মধ্যযুগীয় গোষ্ঠী নায়কের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। রামপ্রসাদের মতোই কোনো রাজসভা বা রাজা জমিদার জাতীয় সমবেত চিন্তরঞ্জন এর উদ্দেশ্যে পদ রচনা করেন নি তিনি।

শাক্ত কবিতার জন্ম বাঙালির তন্ত্রসাধনা ও শক্তি উপাসনার মধ্যে দিয়েই কাব্যের নিজস্ব সূত্র অনুসরণ করে শাক্তগীতি পদাবলী বাংলা গীতিকবিতার একটি মহত্তর ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে। তাই পৃথিবীর নানান ধর্ম সাহিত্যের মতোই শাক্ত পদাবলীর রস গ্রহণের জন্য ধর্মবিশ্বাস কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

শাক্তপদ বিশেষত উমা সংগীত, শ্যামা-সংগীত কীর্তনীাদের মত কোন সম্প্রদায়ের হাতে আসার জমানোর উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠেনি। মনে রাখা প্রয়োজন শাক্ত পদ বিশেষত শ্যামা সংগীত সম্পূর্ণরূপে ভক্তি প্রকাশক। তাই শাক্তপদের মূল জায়গাই হল ভক্ত ও ভগবান। তাই শ্যামাসঙ্গীত বিষয়ক গানগুলির মূলত তিনটি দিককে গ্রহণ করে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। প্রথমটি উপাস্য, দ্বিতীয়টি উপাসক এবং তৃতীয়টি উপাসনা। এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই শাক্ত পদধারার ক্রমপর্যায়ে ভবেন্দ্রমোহনের শ্যামা সঙ্গীত বিষয়ক শাক্তপদের একটি শ্রেণীকে উপাস্য সঙ্গীত বা মাতৃ মহিমা সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি উপাসক সঙ্গীত এবং অপরটি সাধন সঙ্গীত বা উপাসনা সঙ্গীত রূপে বিন্যাস করে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অরুণকুমার বসুর একটি মত প্রণিধানযোগ্য- “অবশ্যই রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের পরবর্তী কবিদের শাক্ত পদকে সাধন সঙ্গীত বলা সংগত কিনা তা নিয়ে সংশয় জাগতে পারে।” রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত পরবর্তী কবিদের মধ্যে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, দাশরথি রায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ করলেও হয়তো কোন কারণবশত প্রচার বিমুখ কবি ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর নাম উল্লেখ করেন নি। হয়তো ভবা পাগলার কোনো পদ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

তন্ত্রসাধনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই শরীরী রূপকে আশ্রয় করে অরূপ ব্রহ্মে পৌঁছানো, মূর্তিকে অবলম্বন করেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা। বাংলার শক্তির সাধকগণ দেবীকে সাধনা করেছেন কালী মূর্তিতেই। শাক্ত কবিরা নিজেদের অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে কালী মা-এর প্রকৃত রূপ দেখতে পেয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন শক্তিরূপা দেবীই একসময় প্রেমের মহিমাময় রূপ প্রকাশ করার জন্য অপ্রাকৃত লীলা করেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনি পুরুষ তিনিই অসীম শূন্য। এককথায় বলতে গেলে আমাদের দেশে শক্তিসাধনা এবং বৈষ্ণব সাধনা, শাক্ত সাধক ও বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে যে বিরোধ দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এক অভেদতত্ত্ব এবং সমন্বয়ের সুর শুনিয়েছেন শাক্ত সাধকরা এই পর্যায়ে। আসলে এই মানসিকতা আধুনিক যুগের প্রাক্কালে জাগ্রত এক সংস্কার মুক্ত ধারণা। এই ধারণার প্রকাশ পাই আমরা সমকালীন কবি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে। হরিশোড়ের আখ্যানে কবি ভারতচন্দ্র দেখিয়েছেন হরি এবং হর অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শাক্ত পদের এই পর্যায়ে কবিদের মধ্যে এই অভেদতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবানের মাঝে যেন কোনো তফাত নেই। ঠিক একই চেষ্টা আমরা পাই ভবা পাগলার চিন্তায়। একটি গানে তিনি বলেছেন-

“মা, তুমি ধর বাঁশি, (আর) কৃষ্ণ ধরুক অসি,
দেখবো আমি, কেমন লাগে, থেকে পাশাপাশি।

এই যে মধুর তত্ত্ব, ভাবের তত্ত্ব, তাই তো পরাণ ভরে হাসি।

যে, যা বলুক, ভালো মন্দ, দ্বন্দ্ব সমান,
অভিন্ন এ ভাবের মূর্তি, ভক্ত যেমন সাজান।

কালীর অসি, কৃষ্ণের বাঁশি,
ব্রজবাসী (আর) শ্মশানবাসী।”

• ভবা পাগলা: উপেক্ষিত বৈষ্ণব পদকর্তা

১. গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরসের সমাহার দেখা যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর- এই পঞ্চরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর রস। কিন্তু যে বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল এই পাঁচটি রসের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভক্তি। এই ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভক্তের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক। যেখানে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে রাধা-কৃষ্ণের নীরব সেবায় থাকে মগ্ন। ভক্ত নিজেকে রাধা কৃষ্ণ লীলার সহায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভক্তি থেকেই আসে নির্ভরতা। ভবা পাগলার গানের মধ্যেও এই ভক্তি মিশ্রিত নির্ভরতা ও ঈশ্বরের প্রতি এক নিবেদনের ছবি পাই-

“তুমি বিনে আর কেউ নেই আমার,

দগ্ধ হৃদয়ে দিতে শাস্ত্রনা।”

২. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন অনুসন্ধান করলে আমরা যে সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করি, তার আড়ালেও লুকিয়ে আছে প্রেম ও প্রকৃতি ভাবনা। ভবা পাগলার গানেও সেই প্রেম ও প্রকৃতির সমন্বিত রূপ প্রকাশিত ও প্রচারিত। এবং সেই প্রেমের মূল উপাদান অবশ্যই ভক্তি। ভবা পাগলা তাঁর গানেও প্রেমের সেই চিত্রটিই ভক্তি'র সহযোগে তুলে ধরেছেন-

“ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু

কৃষ্ণ ভবার মায়ের গুরু।

মাটি হয় রে, শুষ্ক মরু

প্রেম বারি প্রবেশিলে।”

মানুষই সুন্দরের পূজারী, প্রেমেরও। প্রেম ও ভক্তিই মানুষকে দিতে পারে সঠিক জীবনের ঠিকানা। আর মানুষ মাত্রই তো চায় জীবনে চলার সঠিক পথ। যে পথ তার জীবনকে করে তুলবে সহজ-সরল ও সুন্দর। প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে সুন্দরের অথবা প্রেমের পথগামী করে তুলতে মা'কে কখনো কালীরূপ ধারণ করতে হয়েছে, তো কখনো আবার কৃষ্ণ

রূপ ধারণ করতে হয়েছে। তাই কবি বলেছেন -

“তুমি ভাবো কালী, তিনি বনমালী,
কভু ধরে বাঁশী, কভু ধরে খাঁড়া।”

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় আমরা একই চেতনা পাই ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য’। বিদ্রোহী কবির সাথে মিশে আছে যে প্রেমচেতনা সেই প্রেম চেতনাই বৈষ্ণব পদাবলীর এমনকি ভবা পাগলার গানেরও আলেখ্য। সময়ের ব্যবধান প্রেমচেতনাকে পরিবর্তিত করলেও প্রেমের মুখ্য উপাদান কখনই বদলায়নি।

৩. ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী মাতৃ আরাধনার ক্ষেত্রে মা কালী কে কালী নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। অর্থাৎ তিনি মাকে কখনো কালি কখনো কৃষ্ণ নামে ভজনা করে বলেছেন-

কঠে কঠে গাহ কালী নাম

গাহ কৃষ্ণ নাম

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে মুরারে মধুর সুরে

ভরে দাও মন এহেন সংসারে।”

বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রেমচেতনায় প্রেম শুধুমাত্র নর-নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই প্রেম কখনও ঈশ্বরপ্রেম আমার কখনও তা মানব প্রেমের জয়গানে মুখরিত হয়েছে। ভবা পাগলাও তাঁর গানে ঈশ্বর প্রেমের সাথে মানবপ্রেমকে মিলিয়ে দিয়ে সংসারের প্রতি বা জাগতিক দায়িত্বের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হতে শিখিয়েছেন। ঈশ্বরকে এভাবে জাগতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার যে চেতনা আমরা ভবা পাগলার গানে পাই তা পদাবলীর ইতিহাসে তাঁকে এক অনন্য স্থানের অধিকারী করেছে। একইসাথে এই বিষয়টিও মনে রাখা প্রয়োজন, সংসার জীবনে দেবতাকে আরাধনার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন কেউ কেউ শৈব মত গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ শাক্ত মত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মানুষ মনে করে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে গেলে সেই নির্দিষ্ট দেবতাকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভবা পাগলা মানুষের এই চিরাচরিত সনাতনী মত ও পথকে ভেঙে বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরকে আরাধনা বা বিস্তৃত অর্থে ভক্তির কোনো নির্দিষ্ট পথ হয় না। ক্ষুদ্র জাত-পাতের বিচারের উর্ধ্বে উঠে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে মানুষের জয়গান গেয়ে মানবতার প্রতিষ্ঠাই ঈশ্বর আরাধনার মূল লক্ষ্য- এই বাণীটিই ভবা পাগলা আজীবন তাঁর শিষ্যদের শেখাতে চেষ্টা করেছেন।

• সাহিত্য মূল্য:

১. সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ, তাই সাহিত্য বিচারের প্রধান কণ্ঠিপাথর ‘জীবন’। কেননা জীবনের বহু বিচিত্রতার প্রকাশই হল সাহিত্য। যে সাহিত্য

যত বেশি জীবনরসে পরিপূর্ণ সে সাহিত্য তত বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও সমাদর লাভ করে। জীবনের নানান দিক উন্মোচন করে সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ প্রদান করাই হলো সাহিত্য রচনার অন্যতম লক্ষ্য। জীবনের নানা স্বরূপ উন্মোচনে আমাদের কাছে সাহিত্য বিশেষভাবে উপযোগী। ভবা পাগলার গানে জীবন শিক্ষার বিচিত্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। জীবনের নানা পর্যায়ে আমাদের যে সমস্ত বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় সেই বাঁধা থেকে উত্তরণের পথ তিনি তাঁর পদের মাধ্যমে বলে দিয়ে গেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁর গান থেকে আমরা জীবনের দীক্ষাগুলো শিখতে পারি তা শুধুমাত্র একটি সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তার শাস্ত্রত। সাহিত্য চিরকাল মানুষ ও জীবনের মাঝে এই শাস্ত্রত মেলবন্ধনের কথাই বলে থাকে। তাই ভাবা পাগলার জীবনমুখী গান বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ।

ক) “ধর্ম-কর্ম নাই মোর কর্তব্য যাহা। পালন করিয়া আমি বুঝাইরে তাহা।।”

খ) “কেউতো কারো নয়, একথাটি সত্য

বুঝেও বুঝে না মন, তুমি যে অনিত্য।

ঐ দেখ শ্মশানে, কিবা নিশিদিনে,

পুরিতেছে মানবের, যত অহংকার।।”

গ) “জাত নাই, কুল নাই, সমান অধিকার

সবারই তরে, সবাই আমরা, সবাই অবতার

কালী কৃষ্ণ আল্লাহর রসুল, বাঁধা একই সুরে।।”

ঘ) আসিয়াছি যাব নিশ্চয় এ অতি সত্য,

শরণ রাখিও মন তুমি যে অনিত্য।।”

২. বৈষ্ণব কবিদের প্রেমলীলা বর্ণনার নিপুনতা এবং রাধিকার অন্তরাত্মা বর্ণনার সজীবতা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল-

“সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি

কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি।”

আর এই বৈষ্ণব পদাবলীর পথ শেষে আমরা পাই শাক্ত পদাবলী কে। শাক্ত সাহিত্য ধারায় একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাধকগণ উপলব্ধির উপর ভর করেই কঠিন তপস্যার পথে অগ্রসর হয়ে রহস্যময় শক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে স্বাভাবিকভাবেই কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। তাই তো শাক্ত কবিদের জননীর প্রতি নিগূঢ় অভিমান বিবাহিতা কন্যার বিরহে মায়ের মনের অসীম যন্ত্রণা ভোগ আমরা শাক্ত পদাবলীতে ছড়িয়ে পড়তে দেখি। কবি সাধক ভবেন্দ্রমোহন সাধনার পথ পেরিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন একান্তবর্তী আটপৌরে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন সংসার জীবনের চিরকালীন মাতৃত্বের ছবিটি।

৩. শাক্ত পদাবলী সংসারে মেনকা, উমা ও হিমালয়কে কেন্দ্র করে ভক্তি রস প্লাবিত। মা ও মেয়েকে কেন্দ্র করে আগমনী বিজয়ার গানে বাৎসল্য রস ফুটে ওঠে। অপরদিকে মা ও ছেলের মান অভিমানের পালা কে কেন্দ্র করে শ্যামা-সঙ্গীতে বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্তরস ফুটে উঠেছে। ভবা পাগলা চিরকালীন মাতৃ চরণে আশ্রয় চেয়ে খুঁজেছেন নির্ভরতার ঠিকানা। যে ঠিকানায় সন্তান বীর সাহসে বিরজমান হয়ে বলিষ্ঠ হৃদয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বলেছেন -

“বুদ্ধি নাই মোটে, জ্ঞান ও তেমন, বিবেচনা বড়ই কম

কালী বলে, ডাকি এই মহাসুখ, ভয় করে মোরে যম।।”

সাধক কবির দৃষ্টিতে মায়ের রূপ বর্ণনায় বীর রস, রৌদ্র রস, ভয়ানক রস মিলেমিশে একাকার হয়ে রূপ পেয়েছে নানান পদে। বিশ শতকীয় চেতনায় ভাব ও রসের এহেন রূপান্তর পদকর্তার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

“লোল জিহ্বা তোমার, করিয়া বিস্তার,

নাশিলে, নাশিলে মাগো, তোমারি এ সংসার।

ভীষণ খড়গ লয়ে আবার, চলিস ধেয়ে,

সঙ্গে সঙ্গে চলে ডাকিনী যোগিনী।।”

সন্তানের চোখে মায়ের এ এক অন্যরূপ। যে রূপ কোমলে ভৈরবে সৌন্দর্যে গৌরবে মাধুর্যের ভীষণ অর্থে এক অপরূপ গতি চাঞ্চল্যে সমগ্র জীবনের বিচিত্র ভাবরাশি যেন যুগপথ উচ্ছ্বসিত হয়ে শক্তিরূপে সর্বনাশী রূপধারণ করে ধাবিত হয়েছে। মায়ের এ হেন বিরল রূপ ভবেন্দ্রমোহন তথা ভবা পাগলার দৃষ্টিতে যেভাবে ধরা পড়েছে তা একান্তই দুর্লভ। দুর্লভ চিত্রে ভক্তের আরাধনার ধন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তির অবিভিন্ন লীলার যেন যুগপৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাণীরূপ ব্যক্ত হয়েছে। আবার মা এর বীর তথা ভয়ানক রূপের কারণ জানতে চেয়ে বলেছেন -

“কোন কালে তুই কালি হ'লি

আমায় কালী বল না খুলে

করুণা ভূষিত অঙ্গে মুণ্ডমালা কেন গলে।।

রক্ত নিয়ে খেলা করা

এও কি সম্ভবে তারা।

অমন ধারা কেনে খাঁড়া,

কমল হাতে নিলি তুলে।।”

ভবা পাগলার গানে আবদার অভিমান সংশয়, অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-যন্ত্রণার নানাদিক সঞ্চরী ভাবের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

৪. ‘কালি কালি মুখে বল

ভবসিদ্ধি পারে চল।।’

কালী নামের আশ্রয়েই ভবসিদ্ধি পার হওয়া যায়। শুধু ভবসিদ্ধি পার হওয়াই নয়
কালি ও কৃষ্ণকে এক করে দিয়ে তার ঘোষণা-

“কালী নাম জপলে পরে,

যাবি রে, মন, ব্রজপুরে।

বাজায় বাঁশি মোহন সুরে

হৃদে বসি ব্রজের শ্যাম।।”

কালী অর্থাৎ এখানে কৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে। তাই কৃষ্ণ নাম জপলে
ঘরে বসেই ব্রজপুর বৃন্দাবন ধামে যাওয়া যায়। যেখানে কালী মোহন সুরে
বাঁশি বাজায়। যে বাঁশির সুর মুছনায় ব্রজের রাখাল বালক কৃষ্ণকে হৃদয়ে
লাভ করা যায়। কালী কৃষ্ণ নাম ভোজন্যের মধ্য দিয়ে ভবসিদ্ধি ব্রজপুর বৃন্দাবন
লাভ করলে মনের মধ্যে যে প্রেম তরঙ্গ জেগে উঠবে সেই প্রেম তরঙ্গে মনের
সমস্ত অন্ধকার যাবে পালিয়ে। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে। অন্তরের ভক্তিই পারে
আমাদের ঈশ্বরের পূর্ণ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের
মধ্যে দিয়ে বলেছেন- ‘কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনা- পাতব আসন
আপন মনের একটি কোণায়’। ভবা পাগলার পদে রবীন্দ্র দর্শনের এই দিকটাই
আমরা প্রস্তুত হতে দেখেছি।

৫. শাক্ত পদাবলীর ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ভক্তের আকুতি
পর্যায়। ভক্তের আকুতির অর্থ হল আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি ভক্তের আন্তরিক
আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেকের কামনা ও আকুতি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল ভক্তের
আকুতি পর্যায়ে পদে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানিতে পরিপূর্ণ এই চিত্রই অঙ্কিত
হয়েছে। সেই গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার কামনায় ভক্ত চান জগৎ
জননীর স্নেহ ছায়া। ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ গুলি পাঠকের কাছে নানা
কারণে আকৃষ্ট হয়, প্রথম কারণ সমাজ বাস্তবতা এবং অন্য কারন গুলির মধ্যে
উল্লেখযোগ্য হল দেবীকে মাতৃরূপে চিত্রিত করে নিজেদের দুঃখ যন্ত্রণার কথা
তার কাছে নিবেদন করা এবং দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় লাভ করা। ভক্তের
আকুতি পর্যায়ের পদ রচনা রামপ্রসাদ সেন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রামপ্রসাদ পরবর্তী
শাক্ত পদধারায় ভবা পাগলার পদেও ভক্তের আকুতি চিত্রিত হয়েছে।

“তোমার মহিমা, বুঝিতে পারি না,

ক’র না, ক’র না ছলনা।

মায়াজালে ফেলিয়া, কি করিস মা মহামায়া,

কি খেলা খেলাস মা ভুবনেশ্বরী।।”

আবার ভবা পাগলার অপর একটি গানে পাই-

“বড় অন্ধকারে পড়ে আছি মা,
একবারও তুমি চেয়ে দেখ না।

এ তামসী নিশা ছুটিবে না কি, বল মা, বল মা এলোকেশী।।”

উপসংহার:

জীবন শিক্ষায় পরিপূর্ণ কিছু মানুষের আদর্শ আমাদের সাধনার পথকে দৃঢ় করে। বিশ শতকীয় এমনই একজন সাধক হলেন ভবা পাগলা। তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর শিক্ষাকে পাথেও করে বহু মানুষ তাদের জীবনের আদর্শকে নির্মিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মহান সাধক তথা পদকর্তা, কবিকে সাহিত্যের আলোচনায় কেন্দ্রীভূত করা হয়নি। পদাবলী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভবা পাগলার পদ চর্চিত নয়, শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রেও এমনকি বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রেও। সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি বৃহৎ শ্রেণীর মানুষ তাকে সাধক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি এই সম্মানের অংশীদার। সাহিত্যের আলোচনায় বিশেষত পদাবলীর ধারায় আমি ভবা পাগলার গুরুত্বকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে ধরতে চাইছি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. বাগচী, র. (২০২২). মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারী বঙ্গবন্ধু ও ভবা পাগলা. Retrieved from <https://voboghurekotha.com/voba-pagla/>
২. ভট্টাচার্য, ক. (২০১১). বছরভর দেবী পূজো পান ভবা পাগলার বাড়িতে. আনন্দবাজার পত্রিকা.
৩. ক্ষেত্রী, গ. (২০০৯). ভবা পাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-২. দীঘা, ভবার হরবোলা মন্দির.
৪. ক্ষেত্রী, গ. (২০০৮). সাধনার পথে, দীঘা, ভবার হরবোলা মন্দির.
৫. ক্ষেত্রী, গ. (২০০৮). ভবার সঙ্গীত সুধা. দীঘা, ভবার হরবোলা মন্দির.
৬. চক্রবর্তী, গ. র. (১৯৯৫). ভবা পাগলার জীবনী ও গান. ঢাকা, বাংলা আকাদেমি.
৭. শীল, র. (১৯৯৪). লোকগুরু ভবা পাগলাঃ ধর্ম ও সাহিত্য. Retrieved from <https://www.literacyparadise.com/2021/07/Unknown-Story-of-Bhaba-Pagla.html>
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ত. (১৯৮৮). নামের ফেরিওয়ালা ভবা পাগলা. দীঘা, হরবোলা মন্দির.
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ত. (১৯৮৫). পরমগুরু ভবা পাগলা. কলকাতা, নলিনী প্রকাশনী.
১০. Lorea, C. E. (2015). If People Get to Know Me, I'll Become Cow-dung: Bhaba Pagla and the songs of the Bauls of Bengal. Puspikā: Tracing Ancient India through Texts and Traditions: Contributions to Current Research in Indology, 3, 119-42.
১১. Lorea, C. E. (2016). 4 Transmission, Tradition and Technology: Training and Learning in the Bhaba Pagla Community. In Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman, 1(9), 235-249.
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অ. (২০২১). ভাবের পাগল বহুরূপী ভবা পাগলা. Retrieved from <https://www.literacyparadise.com/2021/07/Unknown-Story-of-Bhaba-Pagla.html>